Department of Patents, Industrial Designs and Trade Marks

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

February, 2024

GI Journal No. 32

Published on :

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
7/2/24
মহাপরিচালক

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনেরপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৫৭

আবেদনের তারিখ: ০৬-০২-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য "টাঙ্গাইল শাড়ি" যা শ্রেণি ২৪ ও ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "টাঙ্গাইল শাড়ি"

শ্রেণী ঃ ২৪ ও ২৫

ক) **আবেদনকারী নাম** ঃ জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল

খ) **ঠিকানা** ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা** ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ চার প্রকার।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ

১. টাঙ্গাইল শাড়ি সম্পূর্ণ হাতে বুনন করা হয়। তবে বর্তমানে মেশিন তাঁতেও বুনন করা হয়ে থাকে।

২. যমুনা, ধলেশ্বরী নদীর পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু শাড়ি বোনার উপযোগী।

৩. নদীর পানির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য সুতার প্রক্রিয়াজাতকরণ (যেমনঃ সুতা রঙ করা, মাড় দেওয়া) ভাল হয় এবং রঙের স্থায়িত্বের পাশাপাশি কাপড়ের স্থায়িত্ব ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

৪. শাড়ির পাড়ের নকশায় বৈচিত্র্য রয়েছে। পুরো বুননের পর পাড়ের ও জমিনের কিছু কিছু নকশা আলাদাভাবে হাতে বুনন করা হয়।

৫. আরামদায়ক একটি পরিধেয় বস্ত্র যা যেকোন ঋতুর সময় পরিধান করার উপযোগী।

৬. টাঙ্গাইল শাড়ি মার্জিত, রুচিশীল ও আভিজাত্যপূর্ণ।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা** ঃ

"নদী চর খাল-বিল গজারির বন
টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন"

বা

"চমচম, টমটম, তাঁতের শাড়ি
এই তিনে মিলে টাঙ্গাইলের বাড়ি"

এই প্রবাদগুলোতে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্য ও শাড়ির কথা উঠে এসেছে। একইভাবে টাঙ্গাইলের জেলা ব্র্যান্ডিং স্থান লাভ করেছে টাঙ্গাইল শাড়ি। প্রাচীনকাল থেকেই দেশ ও দেশের বাহিরে জনপ্রিয় বস্ত্র টাঙ্গাইল শাড়ি। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার তাঁতিদের দ্বারা তৈরি হয় এই শাড়ি।

অতীতে টাঙ্গাইলের যেসব উপজেলায় তুলা চাষ হতো তা দিয়ে সুতা উৎপাদন করতো তাঁতিরা। এর মধ্যে মিহি মসলিন ও সুতি সুতা তৈরি হতো। সুতি সুতা থেকে তৈরি শাড়ি সুতি বা কটন শাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও রেশম বা সিল্ক সুতা দিয়ে তৈরি হয় টাঙ্গাইল সফট সিল্ক, কাতান, মসলিন শাড়ি শতশত বছরের ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। একটি পিওর সিল্ক শাড়ি বুনন করতে এক সপ্তাহ থেকে একমাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

সনাতন ধর্মের বসাক সম্প্রদায়কে টাঙ্গাইল শাড়ির মূল কারিগর বলা হয়। মুঘল আমলে যখন বিশ্বজুড়ে আমাদের মসলিনের জয়জয়কার ঠিক তখন টাঙ্গাইলের বিভিন্ন অঞ্চলের বসাক তাঁতিদের মাধ্যমে টাঙ্গাইল শাড়ির বিকাশ ঘটেছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই তাঁতিগোষ্ঠীর একটি দল সিন্ধু অববাহিকা হয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেখানকার আবহাওয়া ততটা কার্যকরী না থাকার কারণে কিছু অংশ চলে আসে ঢাকার ধামরাইয়ে। তাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ভাগ হয়ে একদল চৌহাট্টা চলে আসে। ধামরাই এবং চৌহাট্টা থেকে কিছু তাঁতি আরো ভাল ও উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে আসেন এবং টাঙ্গাইল এসে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিগরগণ স্থায়ীভাবে টাঙ্গাইল শাড়ি বুনন করেন। সে হিসেবে টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্পের ইতিহাস শতশত বছরের পুরানো। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকুল্যে তাঁতশিল্পের বিকাশ ঘটে। তাঁদের মধ্যে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নি, দেলদুয়ারের জমিদার আব্দুল করিম গজনবী, সন্তোষের জমিদার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বেশ কিছু ধনাঢ্য হিন্দু, মুসলিম ব্যবসায়ী এতে সম্পৃক্ত ছিলেন। সনাতন ধর্মের তাঁতিরা বসাক, পাল, নন্দী, বারাস, প্রামাণিক, সাধু, শীল, সরদার বিভিন্ন গোত্রের নামে পরিচিত। টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলায় মুসলিম তাঁতিদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। তারা বসাকদের কাছ থেকেই তাঁতে শাড়ি বুননের কাজ শিখেছেন। দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল গ্রামের চন্ডি গ্রামের বসাক পাড়া, কর্মকার পাড়া, মন্ডল পাড়ায় তাঁতের সংখ্যা বেশি।

মূলত সূক্ষ্ম বুনন পদ্ধতি এবং মিহি হওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি খ্যাতি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে এমন মিহি সুতার কাজ হতো, যা ১৯২৯ সালের বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের কুটিরশিল্প বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। সেখানে লেখা আছে, "The popularity of this cloths is due to fact that they are fine and look well. The Bajitpur weavers use 120 to 250 counts of yarn for fine cloths."

ট্র্যাডিশনাল টাঙ্গাইল শাড়িতে বর্ডার থাকে, বডিটা প্লেইন হয়। আট, দশ বা পনেরো ইঞ্চি চওড়া আঁচলে নানা রকমের স্ট্রাইপ থাকে। তৎকালীন সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান অনুযায়ী নির্ভর করে সুতি শাড়ি প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতিতে কোন ধরনের শাড়ি পরা হয় তা বিবেচনা করে শাড়ি তৈরি হতো। বিধবা, সধবা এবং কুমারী এই তিন শ্রেণির নারীদের জন্য আলাদা আলাদা শাড়ির প্রচলন আছে। সধবা এবং কুমারীদের জন্য নকশাপাড় ও বুটিদার শাড়ি এবং বিধবাদের জন্য এক রঙা থান শাড়ি। ১৯২৩-২৪ সালে কাপড়ে নকশার প্রচলন শুরু হয় এবং ১৯৩১-৩২ সালে নকশার জন্য জ্যাকার্ড পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর শাড়ির পাড় ও জমিনের নকশায় অনেক বেশি বৈচিত্র্য আসে। মূলত পাড়ের নকশা আগে তোলা হয় এবং এর সাথে মিল রেখে জমিনের নকশা তোলা হয়। শুরুতে টাঙ্গাইল শাড়ি ছিল ১০ হাত, পরবর্তীতে ১২/১৩/১৪ হাত শাড়ি তৈরির প্রচলন হয়। তুলনামূলক দামি কটন ও সিল্ক শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে।

টাঙ্গাইল শাড়ির মধ্যে সিল্ক শাড়ি একটি বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। জানা যায় একসময় টাঙ্গাইলের তাঁতিরা মসলিন তৈরি করতেন। পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে তাঁতবস্ত্র রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্রাধান্য পায় কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন এ দেশের শাসনভার তুলে নেয়, তাঁতশিল্পে তখন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপরেও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা মসলিনের উত্তরসুরী হিসেবে আজও তৈরি করছে মসলিন জামদানি, পিওর সিল্ক, সফট সিল্ক, কাতান, দোতারা সিল্ক, তসর সিল্ক, টিস্যু সিল্ক ইত্যাদি শাড়ি।

টাঙ্গাইল শাড়ি মোঘল আমল থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং দেশে-বিদেশে ক্রেতাদের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বিশেষ করে আশির দশকে টাঙ্গাইল শাড়িতে নতুনত্ব আনয়নে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকার বেইলি রোডের টাঙ্গাইল শাড়ি কুটিরের স্বত্বাধিকারী মুনিরা এমদাদ অন্যতম। নব্বই দশকে মিডিয়ার কল্যাণে টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি ও তাঁতশিল্পের ব্যাপক প্রচার হয়। টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প, তাঁতিদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা কর্ম অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে। ইন্টারনেটে বেশ কিছু রিসার্চ পেপারও দেখা যায়। দেশের বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষক টাঙ্গাইলের তাঁতসমৃদ্ধ এলাকায় তথ্য সংগ্রহে আসেন। এছাড়া লোকজ ছড়া, গল্প, গান, প্রবাদ-প্রবচন, নাটক, সিনেমায় টাঙ্গাইল শাড়ির অতীত ঐতিহ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

টাঙ্গাইল শাড়ি বুনার মূল কাজ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারি যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। এ বুনন প্রক্রিয়া সুপ্রাচীনকাল থেকে একটি ঐতিহ্যের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। এ জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও নিষ্ঠা। এই জ্ঞান ও নিষ্ঠা না থাকলে আসল টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করা যায় না। তাঁতিদের ভাষ্যমতে, আদি বা আসল টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করতে শুধু তাঁতি নয়, শিল্পী হতে হয়। টাঙ্গাইলের কারিগরগণ একেকজন দক্ষ বুননশিল্পী। খুব দরদ ও গভীর মনোসংযোগের সাথে টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করা হয় এবং কারুকাজ করা হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্যভাবে। এ কারণে টাঙ্গাইল শাড়ির সুখ্যাতি ও সমাদর বিশ্বজুড়ে। অতীতে দিল্লীর দরবার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজদরবারে যেমন মাথা উঁচু করে ছিল, আজও তেমনি সগর্বে টিকে আছে আমাদের টাঙ্গাইল শাড়ি।

টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারী ও পুরুষ তাঁতি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন কাজে বাড়ির শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। তাঁত যন্ত্রে বুনন করা, সুতা রঙ করা, সুতা বিন্যাস, সানা সাধারণত পুরুষেরা করে থাকে। চরকায় সুতা গোছানো, সুতায় মাড় দেওয়া, নলীতে সুতা পেঁচানো ইত্যাদি কাজ নারীরা করে থাকেন।

ঘর থেকে শুরু করে অফিস-আদালত কিংবা উৎসব আয়োজনে টাঙ্গাইল শাড়ির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, ঋতুভেদেও টাঙ্গাইল শাড়ির বৈচিত্র্য ও ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। গ্রামের সাধারণ নারী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত প্রায় সকলের প্রথম পছন্দ টাঙ্গাইল শাড়ি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টাঙ্গাইল শাড়ি শত শত বছর ধরে রপ্তানি হয়ে আসছে। টাঙ্গাইল শাড়ির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। শুধুমাত্র ভারতেই প্রতি সপ্তাহে লাখ লাখ সংখ্যার শাড়ি রপ্তানি হয়। এছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশে টাঙ্গাইল শাড়ির পরিচিতি ও চাহিদা রয়েছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারি ও খুচরা ক্রেতারা শাড়ি কিনতে টাঙ্গাইলে আসেন। ২০০ টাকা থেকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত শাড়িগুলোর দাম হয়।

টাঙ্গাইল শাড়িতে ব্যবহৃত সুতার কাউন্ট ঃ

টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরিতে সাধারণত ২০/১, ৪০/১, ৬০/১, ৬০/২, ৬১/১, ৭০/১, ৭২/১, ৭৪/২, ৮০/১, ৮০/২, ৮২/১, ১০০/১, ১০০/২, ১০২/১, ১১০/১, ১২০/১, ১২০/২ ইত্যাদি কাউন্টের সুতা ব্যবহৃত হয়। বিশেষ কিছু শাড়িতে ২০০, ২৫০, ৩০০, ৪০০ কাউন্ট ব্যবহার করা হয় কিন্তু এ ধরনের শাড়ি কম উৎপাদন করা হয়। টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরির অধিকাংশ সুতা আমাদের দেশে তৈরি হয়। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ৪ ফুট হয়ে থাকে টাঙ্গাইল শাড়ি। সুতার উপর নির্ভর করে এই শাড়িকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. সুতি সুতা দ্বারা তৈরি শাড়ি,

২. রেশম সুতার শাড়ি,

৩. নাইলন সুতার শাড়ি, এবং

৪. মিক্স সুতার তৈরি শাড়ি।

টাঙ্গাইল শাড়ির বিভিন্ন পাড়ের নাম ঃ

১৯২৩-২৪ সালের দিকে টাঙ্গাইল শাড়িতে বিভিন্ন নকশার প্রচলন হয়। সাধারণত শাড়ির পাড়ে ফুল, লতা-পাতা, পাখি, কলকি, ময়ূরসহ বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তোলেন দক্ষ কারিগরেরা। কিছু পরিচিত পাড়ের নাম হলো, জামদানি পাড়, প্লেইন পাড়, কটকি পাড়, মণিপুরী পাড়, জরিপাড়, পদ্মপাড়, মাধবীলতা, মরবি, তেরবি, কুঞ্জলতা, লতাপাতা ইত্যাদি। টাঙ্গাইল শাড়িতে পাড়ের নকশার জন্য পাকানো সুতার সাথে রেয়ন, জরিসুতা, মেটালিক জরি সুতা ইত্যাদির সংমিশ্রণে নকশা করা হয়।

২০১৭ সালে টাঙ্গাইল শাড়িকে "আমার ঘর আমার বাড়ি, গর্বের ধন টাঙ্গাইল শাড়ি" শ্লোগানে ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল। ব্র্যান্ডিং বইয়ের প্রচ্ছদটিও টাঙ্গাইল শাড়ির আদলে তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে ব্র্যান্ডিং শ্লোগান পরিবর্তন করা হয় 'নদী চর খাল বিল গজারীর বন, টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন' শ্লোগানে।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

টাঙ্গাইল জেলার যেসব উপজেলায় শাড়ি উৎপাদন হয়-

১। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হুগড়া, কাতুলী, পোড়াবাড়ি, করটিয়া, ঘারিন্দা পৌরসভা, কাকুয়া, দ্যাইনা, বাঘিল ও ছিলিমপুর ইউনিয়ন।

২। দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল, দেলদুয়ার, আটিয়া ও ডুবাইল ইউনিয়ন।

৩। বাসাইল উপজেলার মধ্যে ফুলকী, হাবলা ও কাশিল ইউনিয়ন।

৪। নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর ও মুকনা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের তাঁতিগণ টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন করে থাকেন। তাঁদের কেউ কেউ লুঙ্গী, গামছা, চাদর, থ্রিপিসও তৈরি করেন।

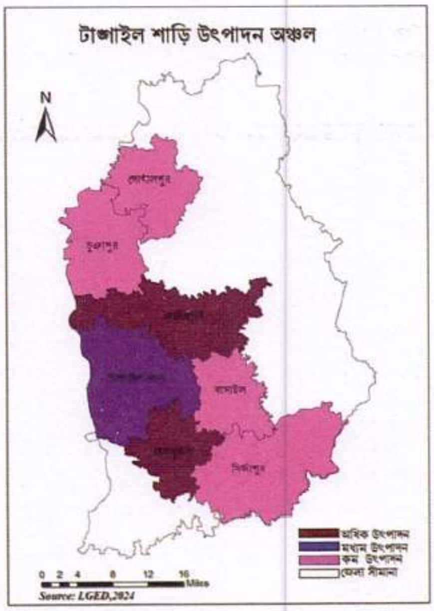

বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে টাঙ্গাইল শাড়ি বিক্রি হয়। এমনকি বিদেশেও রপ্তানি হয়।

জ) উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] ঃ

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার টাঙ্গাইল-এর ১২৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "প্রাচীন তাঁত শিল্প এবং কাঁসার তৈজস পত্রাদি শিল্প পুনরায় মুনাফা অর্জনকারী শিল্প হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। হাতেবোনা তাঁত শিল্প এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যায় জনশক্তি জীবিকার সংস্থান করতে সমর্থ হয়েছে। জেলার তাঁত শিল্পীগণ তাদের মৌলিকত্ব সৃজনীশক্তি এবং সৌন্দর্য-জ্ঞানের জন্য প্রশংসার দাবীদার। হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি বাংলাদেশের সর্বত্র সকল শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে মৌলিক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্যের জন্য জনপ্রিয়। এমনকি শিল্পায়নের যুগেও এই তাঁতীশ্রেণী তাদের মৌলিকত্ব এবং সৃজনী প্রতিভার দ্বারা নিজেদের মর্যাদা অম্লান রেখেছে। অতীতের তুলনায় তাঁতের শাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি এবং এর উচ্চমূল্য তাঁতীশ্রেণী অধিক শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। ১৯৫৫ সালে একখানা ভাল টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির দাম ছিল ৪০ টাকা হতে ৪৫ টাকা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এক খানা ভাল তাঁতের শাড়ি ৩৫০ টাকা হতে ৪০০ টাকায় বিকায়। ১৪৪ পৃষ্ঠায় আছে, টাঙ্গাইল জেলা তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়--এই উপমহাদেশের সকল স্থানেই খুবই জনপ্রিয়। তন্তুবায় শ্রেণীকে সংগঠিত করা এবং তাহাদের উৎপাদিত টাঙ্গাইল শাড়ির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই ত্রিশ দশকের শেষ ভাগে কেন্দ্রী আর্টিজেনস সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়।

অন্যপৃষ্ঠায় আছে, টাঙ্গাইল জেলা প্রাচীনকাল থেকেই বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বাজিতপুরের তাঁতীরা এক রকম সূচী-শিল্প শোভিত উন্নতমানের শাড়ি তৈরী করত। "টাঙ্গাইল শাড়ি" নামে এই শাড়ির নাম প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এই শাড়িগুলো স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি করা হত। তাঁতের শাড়ি এ জেলার গর্বের বস্তু ছিল এবং তা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী করত।

গেজেটিয়ারের ১৮৫ পৃষ্ঠায় আরও আছে, যে সকল গ্রামে হস্তচালিত তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে আদি টাঙ্গাইল, পাথরাইল, নালমান্দা, আকন্দাপাড়া, তারিন্দা, ফটিহাটি, গুলরোয়া, রামপুর, জো-তাইর মনিনগর, বাল্লা এবং করটিয়া উল্লেখযোগ্য।

মামুন তরফদারের 'লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, "মধুপুরের গড়ে আছে শাল গজারীর বন, টাঙ্গাইলের শাড়ি মোদের গরবের ধন।"

জেলা ব্র্যান্ডিং বইয়ের ৩২ নং পৃষ্ঠায় আছে, 'চমচম, টমটম ও শাড়ি, এই তিনে টাঙ্গাইলের বাড়ি।' ৩৫ নং পৃষ্ঠায় আছে, "বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী টাঙ্গাইল জেলা। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোক শিল্প। এর সাথে জড়িত আছে এদেশের সংস্কৃতি। টাঙ্গাইল জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। প্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইলের দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করছেন নানা জাতের শাড়ি। এছাড়াও ৩৫-৫৫ পৃষ্ঠায় টাঙ্গাইলের শাড়ি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল শাড়ি জেলার ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। জামদানি, মসলিনের হাত ধরে এই শাড়ি প্রকাশ ঘটলেও শতশত বছর আগেই আলাদাভাবে নিজস্ব অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার তাঁতের শাড়ির ইতিহাস কয়েকশত বছরের প্রাচীন। এ শাড়ির সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এখানকার আবহাওয়া, মাটি, পানি, বায়ুর। বিশেষ করে যমুনা, ধলেশ্বরীর পানি। এখানকার নদীর পানিতে সুতা ধোয়ার ফলে রঙের পরিবর্তন হয় না এবং রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। অনুকূল পরিবেশের কারণে নদীর পাড় ঘেঁষেই তাঁতি সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় তাঁতিদের ভাষ্যমতে, টাঙ্গাইলের শাড়ি ভাল হওয়ার পিছনে যমুনার পানি, আর্দ্রতা, আবহাওয়ার প্রভাব রয়েছে।

মিহি সুতা থেকে মোটা সুতা, সিল্ক বা রেশম সুতা দ্বারা তৈরি এ শাড়িগুলো একেবারেই টাঙ্গাইলের তাঁতিদের নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা,কল্পনা, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, শিল্পবোধ, রুচি, ধর্মীয় আচার, প্রথা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বুনন হয়। সেই সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে টাঙ্গাইলের প্রকৃতি ও আবহাওয়া। টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে পাথরাইলের বিভিন্ন গ্রামে, কালিহাতি উপজেলা, ভূয়াপুর, মির্জাপুর, গোপালপুর, নাগরপুর উপজেলায় টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদনের ইতিহাস পাওয়া যায় এবং যা এখনো চলমান।

শাওন আকন্দের "বাংলাদেশের তাঁতশিল্প" গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক হাকিম হাবিবুর রহমান প্রদত্ত বিবরণে লেখা আছে , "কাগমারি পরগণা, যা পশ্চিম ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার প্রসিদ্ধ জায়গা, সূক্ষ্ম কাপড় তৈরির ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ঢাকা শহর থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে তুরাগ নামে এক নদী প্রবাহিত রয়েছে যা ময়মনসিংহ জেলার আল্লসিং পরগণার যমুনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ঢাকার আটির সামনে বুড়িগঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে। এই নদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এর তীর বরাবর বাংলার বড় বড় জমিদার, মুসলিম নেতাদের এবং কিছু হিন্দু ধনী পরিবারের অধিবাস রয়েছে। কাশিমপুরের রায়সাহেবরা, তালেবাবাদের সিদ্দিকি সাহেবগণ, সফরতলীর খান সাহেবরা (সম্ভবত শ্রীফলতলী), পাক আল্লাহ (পাকুল্লা) এবং দেলদুয়ারের সৈয়দ ও গজনবী বংশীয়রা,করটিয়ার পন্নি, সন্তোষের রাজা সাহেবরা সকলেরই এই নদীর তীরে বসবাস।

টাঙ্গাইলের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন স্বর্গীয় রঘুনাথ বসাক। তিনি বাজিতপুর এবং আশেপাশের অনেক গ্রাম থেকে শাড়ি সংগ্রহ করে কলকাতায় বিক্রি করতেন। তাঁতের শাড়ি ও বসাক তাঁতিদের উন্নয়নের জন্য রঘুনাথ বসাক ও আরো কয়েকজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ০৮ মে টাঙ্গাইল শহরে গড়ে উঠেছিল "দি টাঙ্গাইল বসাক সম্মিলনী লিমিটেড।"

দি টাঙ্গাইল বসাক সম্মিলনী যেহেতু শুধুমাত্র বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিদের জন্য ছিল, তাই টাঙ্গাইলের সব সম্প্রদায়ের তাঁতিদের কল্যাণে একই বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে মতান্তরে বাংলাদেশ স্বাধীনের পর "দি টাঙ্গাইল কো-অপারেটিভ আর্টিজেন্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন লিমিটেড" নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাঙ্গাইলের লাইসেন্সধারী তাঁতিদের মধ্যে সুতা বন্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁতিরা কিছুটা সুখের মুখ দেখেছিলেন।

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর টাঙ্গাইল শাড়ির প্রধান হাট হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করে টাঙ্গাইল সদরের বাজিতপুর। শুধু দেশি পাইকারই নন, ভারত ও ইংল্যান্ড থেকেও শাড়ি কিনতে আসতেন ব্যবসায়ীরা। তবে বাজিতপুর হাটের পূর্বে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী করটিয়ার হাট যা পূর্বে "মাহমুদগঞ্জের কাপড়ের হাট" নামে পরিচিত ছিল। এই করটিয়ার হাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শত বছর আগে। টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে এই হাটের ইতিহাস। এই হাট থেকে নদীপথে শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত্র ও দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশে নিয়ে যাওয়া হতো। শাওন আকন্দের "বাংলাদেশের তাঁতশিল্প" গ্রন্থে পাথরাইল গ্রামের মনমোহন বসাকের সাক্ষাৎকারে উল্লেখ আছে, বাজিতপুর হাটের আগে পুঠিয়াজানি নামে একটি হাট ছিল যেখানে তিনি এগার বছর বয়সে প্রথম শাড়ি বিক্রি করেন। মনমোহন বসাক ওরফে ভাসা বসাকের জন্ম আনুমানিক ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে ছিল এই পুইঠাজানি বা পুঠিয়াজানি হাট। কালিহাতির বল্লা কাপড়ের হাটটিও ব্রিটিশ আমল থেকে জমজমাট ছিল এবং এখনও আছে।

বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে নানা কারণে মসলিন শাড়ি বুনন বন্ধ হয়ে গেলে টাঙ্গাইলের তাঁতিরা প্রতিকূল অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয় এবং সফল হয়। জ্যাকার্ড ও ডবি মেশিনের ব্যবহার করে টাঙ্গাইল শাড়িতে নানা ধরনের নকশার প্রচলন শুরু হয়। এসব মেশিনের ব্যবহারের আগে টাঙ্গাইল শাড়ি কেমন ছিল তা সম্পর্কে স্বর্গীয় রঘুনাথ বসাকের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপিতে তিনি লিখেছেন, "এরপর ১৩২৫ (বঙ্গাব্দ) সনের পর হইতে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত টাঙ্গাইল তাঁত বস্ত্র শিল্পের ক্রমে বৎসর পর বৎসর আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এই সময়সীমার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে সাদা জমিনে তিন পাইড় অর্থাৎ পাছা পাইড় বলা হইতো এগুলি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হইয়া বাজারে আদরের সহিত বিক্রি হইতো। এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে কিছু কিছু নকশীর কাজ আরম্ভ হইলো, যথা: বেকী পাইড়, চোকবেকী, চাটাই পাইড়। তৎপর বৎসরগুলিতে জরির, আর্ট সিল্ক রঙ্গীন সুতা ইত্যাদি ক্রমে আমদানী হইতে লাগিল। উহা দ্বারা ১৩৩০ সন হইতে ক্রমে চেন পাইড়, বিস্কুট পাইড়, জরির বা সিল্কের চোচা পাইড়, পটাপটি (সিতি সিন্দুর) পাইড়, তাজ পাইড়, আনারকলি পাইড়, চুরি পাইড়, স্কার্ট পাইড়, ফিতাচুরি ফিতা বালেট পাইড়; এতদ্ব্যতীত আরও বিভিন্ন পাইড়ের নমুনার বস্ত্র তৈরি হইতো কিন্তু এসব কাপড়ই সাদা জমিনে ছিল। উপরোক্ত সাদা জমিনে লাল সাদা জমিনে পাছা পাইড় শাড়িগুলি ১৩৩৫ সন হইতে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর ১৩৩০ সনের পর হইতে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত বয়ন শিল্পের আরও উন্নতি হয়। এ সময়ের মধ্যেও কোন মেশিনের সাহায্য ছিল না। সবই হাত পা, বাঁশ লোহার মাকুর সাহায্যে বস্ত্র তৈরি করিত।"

টাঙ্গাইল শাড়িতে নকশার জন্য জ্যাকার্ড ও ডবির ব্যবহার শুরু হয় ১৯২৪-২৫ সালের দিকে। টাঙ্গাইলের মহাভারত বসাকের পুত্র রমেশ বসাক সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারের উইভিং স্কুল হতে জ্যাকার্ড মেশিন ও ফ্লাইসাটলের সাহায্যে বস্ত্রবয়নের ওপর পড়াশোনা করেন এবং লেখাপড়া শেষে টাঙ্গাইলে নিজের বাড়িতে প্রথম জ্যাকার্ড মেশিন ও ফ্লাইসাটলের একটি তাঁত স্থাপন করেন। এরপর থেকেই অনেক তাঁতিদের ঘরে জ্যাকার্ড মেশিনের সাহয্যে বিভিন্ন নকশার শাড়ি বুনন হতে থাকে। রঘুনাথ বসাক তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপিতে উল্লেখ করেছেন, "বসাকদের গ্রামে গ্রামে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় বসাকদের ঘরে ঘরে জ্যাকার্ড ও ফ্লাইসাটলের সাহায্যে উৎকৃষ্ট বয়ন শিল্পের কাজ চালু হইয়া গিয়াছিল। এই প্রকারের দুই এক বৎসরের মধ্যে ১০০/১৫০ ডাঙ্গি জ্যাকার্ড মেশিনে বিভিন্ন নমুনার নকশী লতাপাতা, জরি বা আর্ট সিল্কের শঙ্খ পাইড়, পাহাড় পাইড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎপর ১৩৪০ (বঙ্গাব্দ) সন হইতে ৫০/১০০/১৫০/২০০/২৫০/৩০০ ডাঙ্গি জ্যাকার্ড মেশিনের সাহায্যে

সাদা ও রঙ্গিন জমিনের মধ্যে শুধু মিহি সুতায় হাফ সিল্ক (হাওয়া শাড়ি), ফুল সিল্ক শাড়িগুলির মধ্যে লাল জরি কম, সাদা জরির ও লাল জরির সংমিশ্রণে ১০০/১৫০/২০০/২৫০ ও ৩০০ ডাঙ্গি ইত্যাদি নানা প্রকার লতাপাতা ডিজাইনের মিনা পাইড় শাড়ি তৈরি হইতে লাগিল।" তখনকার টাঙ্গাইল শাড়ির বৈচিত্র্যপূর্ণ পাড় এতটাই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিল যে জামদানি শাড়ির একটি পাড়ের নাম হয়ে যায় "টাঙ্গাইলা পাড়"। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল শাড়িতে বিভিন্ন বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সিনেমার নায়িকাদের গায়েও আমাদের টাঙ্গাইল শাড়ি শোভা পায়। ধাত্রিগ্রামে তৈরি হলেও টাঙ্গাইল শাড়ির মূল যে টাঙ্গাইলেই তা প্রকাশ পায় নির্মল ভট্টাচার্যের কথায়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "আমার কিছুই চাইনা, শুধু ওপারের টাঙ্গাইল বাঁচুক এপারেও।"

মুহম্মদ বাকের সম্পাদিত "টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য" গ্রন্থে ডক্টর আশ্রাফ সিদ্দিকী রচিত "টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্য" নামে প্রবন্ধ রয়েছে। এতে ডক্টর আশ্রাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, "আমরা ছোটবেলায় একটি প্রবাদ শুনতাম 'চমচম, টমটম, শাড়ি-এই তিনে টাঙ্গাইলের বাড়ি'। ছানার তৈরি বিখ্যাত চমচম, এক ঘোড়ার টমটম এবং বিভিন্ন তাঁতের শাড়ির জন্য টাঙ্গাইল অবশ্যই বিখ্যাত ছিল এবং এখনও বিখ্যাত।"

টাঙ্গাইল তথা দেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ রচিত "ইতিকথা" নাটকে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরেছেন। সে নাটকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁতির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা প্রয়াত আবুল খায়ের। তাঁর মুখের একটি ডায়লগ ছিল এমন, "আমরা না আগে লুঙ্গি গামছা বুনাইতামনা, আমরা আগে শাড়ি বুনাইতাম। আমার বাজান হেই ব্রিটিশ আমলে শাড়ি বুনাইছে, হেই শাড়ি বিলাত গেছে। তখনকার দিনে হেই শাড়ি ৫০০ ট্যাকায় বিক্রি অইছে।"

টাঙ্গাইল শাড়ি ও তাঁতিদের জীবন কতটা সমৃদ্ধ ছিল তা এখানকার আঞ্চলিক ছড়া থেকেই অনুমান করা যায়। ছড়াটি হলো ঃ

"চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বান্ধা হাতি।"

("ভাতার" টাঙ্গাইলের একটি আঞ্চলিক শব্দ যার অর্থ স্বামী)

দেলদুয়ার, কালিহাতির গ্রামগুলোতে বড় বড় বিলাসবহুল শো-রুম, বাজিতপুর, করটিয়া, বল্লা হাটে অগণিত ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম প্রমাণ করে টাঙ্গাইল শাড়ির চাহিদা ও জনপ্রিয়তার কথা। আর এ জনপ্রিয়তা একদিনে নয় শত শত বছরের টিকে থাকার ফলাফল।

ঋ) উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ

সুতা ক্রয় করার পর সুতার বিভিন্ন প্রসেসিং এর মাধ্যমে শুরু হয় টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরির কাজ। প্রত্যেকটি ধাপ অনেক নিপুণতা ও ধৈর্য্যের সাথে করতে হয়। বিভিন্ন রঙের শাড়ি তৈরির প্রথম ধাপ, শাড়ির টানা ও বাইনের সুতা রঙ করা। তাঁতিরা সুতার মোড়া বড় বড় পাত্রে গরম পানিতে চুবিয়ে রঙ করে থাকে। এরপর তা রোদে শুকানো হয়। পরে যেসব সুতায় মাড় দিতে হয় সেই মাড় দেওয়ার কাজ চলে। মাড় হিসেবে ভাত এবং খইয়ের মাড় ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, সিল্ক সুতায় মাড় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে নকশাবিহীন পিওর সিল্ক শাড়ি বুননের সময় খইয়ের মাড় ব্যবহার করা হয়। এতে সে শাড়িতে হাতের কাজ, ব্লক-বাটিক প্রিন্ট, হ্যান্ড পেইন্ট ইত্যাদি করতে সুবিধা হয়।

শুকনো সুতা এবার চরকায় পেঁচানো বা পাকানোর পালা। এ কাজটা মূলত নারীরাই বেশি করে। কারণ একটা একটা সুতা গোছানো খুব নরম হাতের কাজ। চরকায় সুতা পাকানোর সাথে সুতার গুটিও তৈরি করা হয়। চরকাতে দুই হাতের ব্যবহার করে সুতা গোছানো হয় নলিতে। এই নলি মাকুতে স্থাপন করা হলে শাড়ির পোড়েন বা বাইনের সুতা তৈরি হয়ে যায়। বাইনের

সুতা প্রস্তুত হয়ে গেলে টানা বা তানার সুতা বিন্যাস করা হয়। লম্বালম্বি বা টানার সুতা বিন্যাস বা সাজানো হয় বাঁশের ফ্রেমে। এটাকে বলে "টানা করা"। লম্বা বাঁশের ফ্রেম ছাড়াও এখন কেউ কেউ আধাযান্ত্রিক ড্রাম পদ্ধতিতেও টানা করার কাজটি করে থাকে। ধরনভেদে প্রতিটি শাড়িতে লম্বালম্বি সুতা থাকে ৪০০০ থেকে ১০০০০, বহরে প্রতি ইঞ্চিতে সুতা থাকে সর্বোচ্চ ৫৪টি। এভাবে প্রতিটি টানায় একবারে ২০ থেকে ১৫০টি শাড়ির সুতা সাজানো হয়। টানা করার পর সুতাকে "নাতা" নামক একটি গোল দন্ডে পেঁচানো হয়। এই নাতায় জড়ানো সুতা নকশা অনুযায়ী ছাঁচে সাজিয়ে নেয়া হয়। এই সাজিয়ে নেয়াকে বলে "সানা করা"। সানা হলো বাঁশের তৈরি একটি লম্বা দন্ডের মতো যাতে চিরুণীর মতো ছোট ছোট ঘর থাকে। উপরে নিচে বাঁশের ফ্রেমের মাঝখানে ঘরগুলো থাকে। একটি সানায় কয়েক হাজার ঘর থাকে। সানার দুপাশে দুজন ব্যক্তি বসে এ কাজটি করে থাকে। প্রত্যেকটা ঘরের ভিতর দিয়ে একটা একটা সুতা কয়েকটি প্যাঁচ দিয়ে অপর পাশের ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেয়। অপর পাশের ব্যক্তি এভাবে দশটা থেকে পনেরোটা সুতা হাতে পেয়ে একটি গিট প্রদান করেন। সানায় এভাবে সুতা সাজানোকে "ব করা" বলে। সানায় সুতা সাজানোর পর তা নরদে পেঁচানো হয়। এ নরদ পরে তাঁতযন্ত্রে প্রতিস্থাপন করা হয়।

ছবি: বাইরের নরদ। এতে তানার সুতা পেঁচানো থাকে।

ছবি: কোলের নরদ। শাড়ি বুননের পর শাড়ি পেঁচানো থাকে।

তাঁতযন্ত্রে নরদ স্থাপন করে সানার ভেতরে সাজিয়ে টানার সুতাকে উপরে ফ্রেমের সাথে টান টান করে রাখা হয় এবং অবশ্যই জ্যাকার্ড মালার সাথে সমন্বয় করে। জ্যাকার্ড হলো মোটা কাগজের তৈরি আয়তাকার প্লেটের সমষ্টি যা একত্রে গেঁথে শাড়ির মাপের সমান করা হয়। প্রথমে গ্রাফ পেপারে ডিজাইন করা হয়, পরে সেই ডিজাইন অনুযায়ী কাগজের প্লেটে পাঞ্চ মেশিন দ্বারা ছিদ্র করা হয়। প্রতিটি প্লেট ছিদ্র করা শেষ হলে একসাথে গেঁথে জ্যাকার্ড মালা তৈরি করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য নকশাবিহীন শাড়িতে জ্যাকার্ড ব্যবহৃত হয় না। দক্তি নামক একটি লম্বা দন্ডের সামনে কখনও দুই পার্ট, কখনও চার পার্ট সানা রাখা হয়। এভাবে টানার সুতা সেট করা বেশ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজ যা আমাদের তাঁতি ভাইয়েরা অত্যন্ত নিপুণতার

সাথে করে থাকে। টানার সুতা সেট হয়ে গেলে পোড়েনের সুতা ভরা নলী মাকুতে সেট করে শুরু হয় শাড়ি বুননের মূল কাজ। টানাতে যেমন পাড়ের সুতা আলাদা থাকে তেমনি পোড়েনের (বাইনের) সুতা ফান্দি নামক একটি কাঠের দন্ডে পেঁচানো থাকে এবং মাকুতেও পাড় এবং জমিনের সুতা আলাদা আলাদাভাবে থাকে। বুননের সময় সানা লাগানো কাঠের দক্তিকে এক হাতে টানা হয়, অন্য হাতে মাকু চালানো দড়ি বাধা হাতল। ডিজাইন অনুযায়ী একেকবার একেক মাকু এপাশ ওপাশ পরিচালনা করা হয়। পায়ের নিচে থাকে তিনটি বাঁশের দন্ড। একত্রে এদেরকে বলে "পারাপারি" আর কালিহাতি এলাকায় বলে পাউঠি। তিনটির একটি পাড়ের জন্য, একটি জমিনের জন্য এবং একটি জমিনে বুটি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে টাঙ্গাইল শাড়ি বুননের প্রক্রিয়া। নকশাবিহীন প্লেইন শাড়ি একদিনে বুনন শেষ হয়। নকশা করা শাড়িতে দুদিন সময় লাগে। সিল্ক শাড়িতে নকশানুযায়ী দুদিন থেকে একমাস সময় লেগে যায়। আবার মসলিন জামদানিতে হাতের কাজ করা শাড়ি তৈরি করতে তিন থেকে চার মাস সময় লাগে। এজন্য এই শাড়িগুলোর দাম বেশি, ৩০০০০ টাকা থেকে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অল্প অল্প করে শাড়ি বোনা হয় আর নাতায় পেঁচানো হয়। পুরো শাড়ি বোনা শেষ হলে তাঁত থেকে নামিয়ে শাড়ির উল্টো পিঠের সুতা হাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়। তারপর আসে শাড়িতে মাড় দেয়ার পালা (সুতি শাড়ির ক্ষেত্রে)। একে বলা হয় "খলান দেয়া"। ভাত বেটে মাড় তৈরি করে হাত দিয়ে কাপড়ে লাগানো হয় অথবা খই, চুন ও পানির তৈরি মাড় দেয়া হয়। শাড়িকে দুটো কাঠের দন্ডের সাথে পেঁচিয়ে রাখা হয়। একটু একটু করে মাড় লাগিয়ে সামনের দন্ডে পেঁচিয়ে রাখা হয়। এরপর রোদে শুকানো হয়। এরপর আয়রন করে হাতেই ভাঁজ করে প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়।

ঞ) ব্যবহারকাল ঃ শতশত বছর ধরে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন ও বিপনন করা হচ্ছে।

ট) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

টাঙ্গাইল শাড়ির বিশেষত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে কয়েক যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় তাঁতিদের মাঝে স্থানান্তরিত অসাধারণ বুননকৌশলের উপর। টাঙ্গাইল শাড়ির মতো এতো বৈচিত্র্যময় নকশার শাড়ি আর কোথাও দেখা যায় না। এই শাড়িগুলোর উপর টাঙ্গাইল জেলার ভূপ্রকৃতিগত প্রভাবও রয়েছে। এই জেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা, ধলেশ্বরী নদীর পানি ও নদী তীরবর্তী বাতাসের আর্দ্রতা টাঙ্গাইল শাড়ি বুননের সুতার রং এর স্থায়িত্ব যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি টেকসই ও মজবুতও করে। ফলে টাঙ্গাইল শাড়ির গুণগতমান অনেক উন্নত হয়।

অন্যান্য ঃ

ভৌগোলিক পণ্য উৎপাদনের ছবিঃ

ছবিঃ সুতার মোড় (সাদা রঙের)

ছবিঃ গরম পানিতে সুতা রঙ করা হচ্ছে

ছবিঃ রঙ্গিন সুতা পানিতে ধোয়া হচ্ছে।

ছবিঃ রং করা সুতা রোদে শুকানোর পদ্ধতি।

ছবিঃ ড্রামের সাহায্যে শাড়ির টানার সুতা বিন্যাস (টানা করা)

ছবিঃ টানার সুতা সানায় সাজানো হচ্ছে (ব করা)

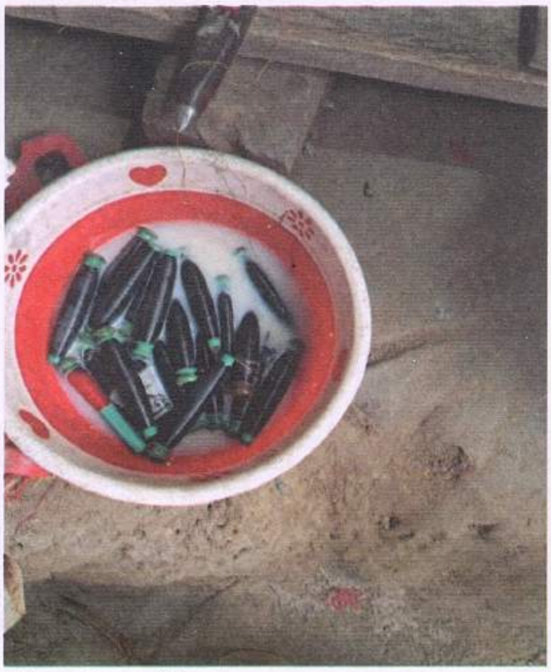
ছবিঃ সুতা ভরা নলী

ছবিঃ তাঁতযন্ত্রে টানার সুতা সেটিং

ছবিঃ চরকা দ্বারা নলীতে সুতা গোছানো

ছবিঃ শাড়ি বুনন চলছে।

ছবিঃ শাড়ি বুনন চলমান

ছবিঃ বুনন সম্পন্ন

ছবিঃ টাঙ্গাইলের শাড়ি

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক শাখা-১১৮০/২০২৩-২০২৪/শিল্প-০৭-০২-২০২৪-১০০ বই।

রেফারেন্স ঃ
১। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার টাংগাইল । নুরুল ইসলাম খান । প্রকাশ কাল: নভেম্বর, ১৯৯০
পৃষ্ঠা: ১২৯, ১৪৪ ও ১৮৫
২। লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য । মামুন তরফদার । প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৯
পৃষ্ঠা: ৪১
৩। জেলা ব্র্যান্ডিং বুক । জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল
পৃষ্ঠা নং: ৩২-৫৫
৪। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প । শাওন আকন্দ । ২০১২
পৃষ্ঠা: ১৫২

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stali,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.